সর্বকালের সেরা ১০০ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার: ভূবিজ্ঞান

০১. পৃথিবীর কেন্দ্রভাগ (১৯০৬)

ভূকম্পনবিদ রিচার্ড ওল্ডহ্যাম নির্ণয় করেন, ভূত্বকের তুলনায় পৃথিবীর কেন্দ্রীয় অঞ্চলে ভূমিকম্পের তরঙ্গ অনেক ধীর গতিতে প্রবাহিত হয়। এ থেকে তিনি সারাংশে পৌঁছেন যে, পৃথিবীর কেন্দ্রভাগ তরল পদার্থে গঠিত।

০২. পৃথিবীর অভ্যন্তরীন কেন্দ্রভাগ (১৯৩০-এর দশক)

১৯৩৬ সালে Inge Lehmann বলেন, ভূমিকম্পের কিছু তরঙ্গ পৃথিবীর কেন্দ্রভাগের একেবারে গভীর অঞ্চল ভেদ করে যেতে পারে না বরং প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসে। এ থেকে বোঝা যায়, পৃথিবীর মূল কেন্দ্র কঠিন লৌহ দিয়ে গঠিত। এই লৌহ কেন্দ্রের চারপাশে তরল লোহার একটি স্তর আছে।

০৩. মহাদেশীয় বিচ্যুতি (১৯১১)

Alfred Wegener প্রস্তাব করেন, পৃথিবীর সবগুলো মহাদেশ একসময় একসাথে ছিল। তারা একসাথে একটিমাত্র ভূভাগ গঠন করেছিল। পরবর্তীতে "মহাদেশীয় বিচ্যুতি" নামক প্রক্রিয়ায় এরা পৃথক হয়ে যায়। দক্ষিণ আমেরিকার সাথে আফ্রিকার খাপে খাপে মিলে যাওয়া, জীবাশ্মের বণ্টন এবং ভূতাত্ত্বিক সাদৃশ্যের মাধ্যমে তিনি এটা প্রমাণ করেন।

০৪. সমুদ্রতলের বিস্তৃতি (১৯৫০-এর দশক থেকে ১৯৬০-এর দশক)

সমুদ্রতলের গভীরতা পরিবর্তন এবং অন্যান্য ভূতাত্ত্বিক আবিষ্কার থেকে পাওয়া উপাত্ত একসাথে করে Harry Hess প্রস্তাব করেন, Wegener কর্তৃক প্রস্তাবিত মহাদেশীয় বিচ্যুতির কারণ হচ্ছে সমুদ্রতলের বিস্তৃতি। তিনি প্রকল্পায়িত করেন, "গ্রেট গ্লোবাল রিফ্ট"-এর (বর্তমানে "মিড-ওশ্যান রিজ") প্লেটগুলোর মধ্যবর্তী স্থানে ভূত্বকের নিচ থেকে গলিত ম্যাগমা চুইয়ে চুইয়ে উঠছে। এই উত্তপ্ত ম্যাগমা শীতল হয়ে রিফ্ট থেকে প্লেটগুলোকে দূরে ঠেলে দিতে থাকে। এর ফলে আটলান্টিক মহাসাগরের প্রস্থ দিন দিন বাড়তে থাকে।

০৫. প্লেট টেক্টোনিক (১৯৬০-এর দশক)

বিজ্ঞানীদের গবেষণায় প্রমাণিত হয়, পৃথিবীর পৃষ্ঠতল পরস্পরের সাথে যুক্ত বেশ কয়েকটি শিলা প্লেটে বিভক্ত করা যায়। পৃথিবীর সর্ববহিঃস্থ স্তর লিথোমণ্ডল-কে অন্তত ৭টি বড় বড় দৃঢ় টুকরোয় ভাগ করা যায়। এই টুকরোগুলো বিন্ন ভিন্ন দিকে ভিন্ন ভিন্ন দ্রুতিতে (বছরে ১-৪ ইঞ্চি) চলাচল করছে এবং পরস্পরের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হচ্ছে। ফলে একে অপরকে টানছে এবং তাদের ঘর্ষণে ক্ষয়ও হচ্ছে। প্লেটের সীমানায় সংঘটিত এই ঘটনাগুরোর কারণেই পাহাড়, আগ্নেয়গিরি এবং ভূমিকম্পের সৃষ্টি হয়।

০৬. ট্রপোমণ্ডল এবং স্ট্র্যাটোমণ্ডল (১৮৯০-এর দশক)

মনুষ্যবিহীন বেলুনে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি স্থাপন করে Leon Teisserenc de Bort আবিষ্কার করেন, বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন স্তর আছে। তিনি লক্ষ্য করেন, উপরের দিকে প্রায় ৭ মাইল পর্যন্ত তাপমাত্রা নির্দিষ্ট হারে হ্রাস পেতে থাকে। কিন্তু এর পর তাপমাত্রা স্থির থাকে। প্রায় ২০০টি বেলুন পরীক্ষা করার পর তিনি সিদ্ধান্তে আসেন, বায়ুমণ্ডল "troposphere" এবং "stratosphere" নামক দুটি স্তরে বিভক্ত।

০৭. ভৌগলিক উষ্ণায়ন (বিংশ শতকের শেষাংশ)

বিজ্ঞানীরা পৃথিবীর পৃষ্ঠতলে তাপমাত্রা বৃদ্ধির একটি ঝোঁক লক্ষ্য করেন। তারা "গ্রিনহাউজ গ্যাস" এর ঘনত্ব বৃদ্ধিকে এর কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেন। ভৌগলিক উষ্ণায়ন তত্ত্ব বলে, উনবিংশ শতকের শেষাংশ থেকে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধির কারণ মানুষ নিজেই। কল-কারখানা থেকে উচ্চ মাত্রায় কার্বন-ডাই-অক্সাইড নিঃসরণের মাধ্যমে মানুষ পৃথিবীল তাপমাত্রা বাড়িয়ে দিচ্ছে। এ সকল গ্রিনহাউজ গ্যাস নিঃসরণ অব্যাহত থাকলে তাপমাত্রা বাড়তেই থাকবে।

০৮. মহাজাগতিক বিকিরণ (১৯১১ থেকে)

১৯১২ সালে Victor Hess একটি উষ্ণ বায়ু বেলুনে (অক্সিজেন ছাড়া) চড়ে ১৭,৫০০ ফুট ভ্রমণ করে সিদ্ধান্তে আসেন যে, উচ্চতা বৃদ্ধির সাথে সাথে বিকিরণের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। আরও পরীক্ষা করে বুঝতে পারেন, এই বিকিরণ মহাশূন্য থেকে আসছে। বর্তমানে আমরা জানি মহাজাগতিক বিকিরণের মূল অংশ হচ্ছে প্রোটন, সে হিসেবে তাদের ধনাত্মক আধান আছে।

০৯. চৌম্বক ক্ষেত্র বিপর্যাস (১৯০৬)

Bernard Brunhes আবিষ্কার করেন, পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্র তার দিক পরিবর্তন করে নিজেকে উল্টিয়ে ফেলেছে। ১৩ মিলিয়ন বছর আগের মায়োসিন লাভার প্রবাহ জমাট বেঁধে তৈরী হওয়া মাটির "প্যালিওম্যাগনেটিক" পরীক্ষা করে তিনি এই আবিষ্কার করেন। এর প্রায় ৫০ বছর পর বিজ্ঞানী মহলে তার আবিষ্কার স্বীকৃতি পায়।

১০. ভূতাত্ত্বিক পরিবর্তন (১৮৩০-এর দশক)

চার্লস লায়েল তার বহু খণ্ডের "Principles of Geology: An Attempt to Explain the Former Changes of the Earth's Surface by Reference to Causes Now in Operation" (১৮৩০ ও ১৮৩৩ সালে প্রকাশিত) গ্রন্থে প্রমাণ দেখান যে, পৃথিবী ধীরে ধীরে বিবর্তিত হয়েছে। এর মাধ্যমে তিনি তখন পর্যন্ত বিতর্কিত "ইউনিফর্মিটারিয়ানিজ্‌ম"-কে সমর্থন করেন। এই তত্ত্বে বলা হতো, পৃথিবী বেশ কয়েক ধাপে ধীর বিবর্তনের মাধ্যমে বর্তমান অবস্থায় উপনীত হয়েছে। সে সময় বাইবেল বর্ণীয়ত "ক্যাটাস্ট্রফিজ্‌ম" বেশি গ্রহণীয় ছিল।

১১. তেজস্ক্রিয়ামিতিক তারিখ নির্ণয় (১৯০৭)

Bertram Boltwood কোন পাথরের তেজস্ক্রিয় ক্ষয় পরিমাপের মাধ্যমে তার বয়স গণনার পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। তার হিসাবে পৃথিবীল বয়স দাড়ায় ২.২ বিলিয়ন বছর। এই বয়স সে সময়ে গৃহীত বয়সের তুলনায় অনেক অনেক বেশী ছিল। বর্তমানে অবশ্য আমরা জানি, পৃথিবীর প্রকৃত বয়স এরও দ্বিগুণ। কার্বন-১৪ সহ বেশ কয়েকটি তেজস্ক্রিয় পদার্থের মাধ্যমে Boltwood এর গণনা কার্যকর করা যায়। ঐতিহাসিক বস্তুর বয়ষ নির্ণয়ে সাধারণত কার্বন-১৪ ই ব্যবহার করা হয়।

১২. পর্যাবৃত্ত বরফ যুগ (১৯৩০-এর দশক)

সার্বীয় জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞানী Miultin Milankovitch দীর্ঘমেয়াদী জলবায়ু পরিবর্তন এবং বরফ যুগের সাথে পৃথিবীর গতির সম্পর্ক স্থাপন করে একটি তত্ত্ব দেন। ঋতু ও অক্ষাংশের ভিত্তিতে সৌর বিকিরণের পরিবর্তন পরিমাপের মাধ্যমে তিনি জলবায়ুর এই গাণিতিক তত্ত্ব দিয়েছিলেন। তিনি বলেন, পৃথিবী-সূর্য জ্যামিতি যেমন কক্ষপথের আকার বা অক্ষের কোণ ইত্যাদির বৃত্তীয় পরিবর্তনের কারণে পৃথিবীতে আগত সৌর শক্তির তারতম্য ঘটে।

সর্বকালের সেরা ১০০ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার: চিকিৎসাবিজ্ঞান

০১. মানব অঙ্গব্যবচ্ছেদবিদ্যা (১৫৩৮)

Andreas Vesalius মানুষের লাশ ব্যবচ্ছেদ করে মানব অঙ্গব্যবচ্ছেদবিদ্যার (অ্যানাটমি) অনেক তথ্য প্রকাশ করেন এবং পূর্বতন ভুল ধারণার অপনোদন করেন। তিনি মনে করতেন, চিকিৎসার জন্য অঙ্গব্যবচ্ছেদবিদ্যা খুবই জরুরি। এজন্যই তিনি নিজে লাশ ব্যবচ্ছেদ করতেন যা সে যুগে একেবারে বিরল ছিল। ব্যবচ্ছেদের মাধ্যমে তিনি রক্ত সংবহন তন্ত্র ও স্নায়ু তন্ত্রের যে ছবি তৈরী করেছিলেন তা ছাত্রদের পড়ানোর কাজে ব্যবহার করতেন। এগুলো এতই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে যে একে অবিকৃত রাখার জন্য তিনি প্রকাশ করতে বাধ্য হন। ১৫৪৩ সালে De Humani Corporis Fabrica বইটি প্রকাশ করেন, এর মাধ্যমেই অঙ্গব্যবচ্ছেদবিদ্যার যাত্রা শুরু হয়।

০২. রক্ত সংবহন (১৬২৮)

উইলিয়াম হার্ভে আবিষ্কার করেন যে রক্ত সমগ্র দেহে প্রবাহিত হয় এবং তিনিই হৃৎপিণ্ডকে রক্ত পাম্প করার যন্ত্র হিসেবে আখ্যায়িত করেন। ১৬২৮ সালে তার বিখ্যাত গ্রন্থ "Anatomical Essay on the Motion of the Heart and Blood in Animals" প্রকাশিত হয়। এই বই আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের ভিত্তি স্থাপন করেছিল।

০৩. রক্তের গ্রুপ (১৯০২)

অস্ট্রীয় জীববিজ্ঞানী কার্ল লান্ডস্টাইনার ও তার দল রক্তের চারটি গ্রুপ আবিষ্কার করে। তারা শ্রেণীকরণের একটি পদ্ধতিও তৈরী করে। এক জনের দেহ থেকে রক্ত অন্য জনের দেহে নিরাপদ উপায়ে স্থানান্তরের জন্য গ্রুপ জানা আবশ্যক।

০৪. অনুভূতিনাশক (১৮৪২ – ১৮৪৬)

বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেন, বেশ কিছু রাসায়নিক পদার্থ অনুভূতিনাশক (অ্যানিসথিশিয়া) হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। এর মাধ্যমে কোন ব্যথা না দিয়ে অস্ত্রোপচার করা সম্ভব। প্রথম দিকে অর্থাৎ উনবিংশ শতকে অনুভূতিনাশক হিসেবে নাইট্রাস অক্সাইড এবং সালফিউরিক ইথার ব্যবহৃত হতো। মূলত দাঁতের চিকিৎসকরা এগুলো ব্যবহার করতেন।

০৫. এক্স-রশ্মি (১৮৯৫)

ভিলহেল্ম কনরাড রন্টগেন ক্যাথোড রশ্মি বিকিরণ নিয়ে পরীক্ষা করার সময় দূর্ঘটনাবশত এক্স-রশ্মি আবিষ্কার করে ফেলেন। তিনি দেখতে পান, এই রশ্মি ক্যাথোড রশ্মি নলের চারদিকে রাখা কালো কাগজ ভেদ করে যাচ্ছে এবং পাশের একটি টেবিলে প্রতিপ্রভার সৃষ্টি করছে। তার আবিষ্কার চিকিৎসাবিজ্ঞান ও পদার্থবিজ্ঞানে বিপ্লবের সৃষ্টি করে। এর জন্য তিনি প্রথম নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হন।

০৬. জীবাণু তত্ত্ব (১৮০০-এর দশক)

ফরাসি রসায়নবিদ লুই পাস্তুর এখতে পান, কিছু অণুজীব রোগের কারণ হিসেবে কাজ করে। সে সময় কলেরা, অ্যানথ্রাক্স ও রেবি-র মত রোগগুলোর কারণ অজানা ছিল। পাস্তুর একটি জীবাণু তত্ত্ব প্রদান করেন। এতে বলা হয়, এগুলো সহ আরও অনেক রোগের কারণ হল ব্যাক্টেরিয়া। পাস্তুরকে "ব্যাক্টেরিয়াবিজ্ঞানের জনক" বলা হয়। কারণ, তার আবিষ্কারই বিজ্ঞানের একটি নতুন শাখার সৃষ্টি করে।

০৭. ভিটামিন (১৯০০-এর দশক)

Frederick Hopkins এবং অন্যান্যরা আবিষ্কার করেন, কিছু নির্দিষ্ট পুষ্টি উপাদানের ঘাটতির কারণে কিছু রোগের সৃষ্টি হয়। এই পুষ্টি উপাদানগুলোকেই পরবর্তীতে ভিটামিন বলা হয়। গবেষণাগারের প্রাণীদের বিভিন্ন খাদ্য খাওয়ানোর মাধ্যমে তিনি বুঝতে পারেন, এই উপাদানগুলো স্বাস্থ্যের জন্য অত্যাবশ্যক।

০৮. পেনিসিলিন (১৯২০-এর দশক থেকে ১৯৩০-এর দশক)

আলেকজান্ডার ফ্লেমিং পেনিসিলিন আবিষ্কার করেন। এরপর হাওয়ার্ড ফ্লোরি এবং Ernst Boris Chain তা পৃথক করে বিশুদ্ধ করেন। এভাবে প্রথম অ্যান্টিবায়োটিক তৈরী হয়। ফ্লেমিংয়ের আবিষ্কারটি ছিল এক প্রকার দুর্ঘটনা। কাঙ্ক্ষিত ফল না পেয়ে তিনি কিছু ব্যাক্টেরিয়া নমুনা একটি পেট্রি ডিশে গবেষণাগারের এক কোণে ফেলে রেখেছিলেন। হঠাৎ লক্ষ্য করেন, গজিয়ে উঠা ছাতা একটি ব্যাক্টেরিয়া মেরে ফেলেছে। ফ্লেমিং তৎক্ষণাৎ ছাতার নমুনাটি আলাদা করেন, এর নাম

ছিল পেনিসিলিয়াম নোটেটাম। পরবর্তীতে নিয়মতান্ত্রিক পরীক্ষার মাধ্যমে ফ্লোরি ও Chain এ থেকে পেনিসিলিন তৈরী করেন যা ব্যাক্টেরিয়াজনিত অনেক রোগের প্রতিষেধক হিসেবে কাজ করে।

০৯. সালফা ড্রাগ (১৯৩০-এর দশক)

Gerhard Domagk আবিষ্কার করেন, প্রোন্টোসিল নামক এক ধরণের কমলা-লাল রঞ্জক সাধারণ ব্যাক্টেরিয়া স্ট্রেপটোকক্কি ঘটিত ক্ষত নিরাময় করতে পারে। এই আবিষ্কার "কেমোথেরাপিউটিক ড্রাগ" (বিস্ময় ঔষধ) বিশেষত সালফা ড্রাগ সংশ্লেষণের দুয়ার খুলে দেয়।

১০. টিকা দান (১৭৯৬)

এডওয়ার্ড জেনার নামক এক ইংরেজ গ্রাম্য ডাক্তার প্রথমবারের মত গুটি বসন্তের টিকা কার্যক্রম শুরু করেন। টিকার মাধ্যমে গরুর বসন্ত রোগ প্রতিরোধ করা যায়, এটা আবিষ্কারের পরই তিনি মানুষের মধ্যে এই কার্যক্রম শুরু করেন। ১৭৮৮ সালে ইংল্যান্ডের গ্রামাঞ্চলে দখন বসন্তের প্রাদুর্ভাব দেখা দেয় তখন তিনি লক্ষ্য করেন, যে সমস্ত রোগী গবাদি পশুর নিয়ে কাজ করেছিল এবং গরু বসন্তের সংস্পর্শে এসেছিল তাদের কারও গুটি বসন্ত হয়নি। এরপরই তিনি তার তত্ত্ব প্রদান করেন।

১১. ইনসুলিন (১৯২০-এর দশক)

ফ্রেডেরিক বেন্টিং ও তার সহকর্মীরা ইনসুলিন নামক হরমোন আবিষ্কার করেন। এই হরমোন ডায়াবেটিস রোগীদের রক্তে শর্করার পরিমাণ ভারসাম্যপূর্ণ রেখে তাদের স্বাভাবিকভাবে জীবনযাপন করতে সাহায্য করে। ইনসুলিন আবিষ্কারের পূর্বে ডায়াবেটিস মানে ছিল একটি ধীর ও নিশ্চিত মৃত্যু।

১২. অনকোজিন (১৯৭৫)

হ্যারল্ড ভারমাস এবং মাইবেল বিশপ অনকোজিন আবিষ্কার করেন। এই সাধারণ জিন প্রতিটি কোষের বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করে, কিন্তু পরিব্যক্তি ঘটলে বা পরিমাণে অতিরিক্ত বেশী হয়ে গেলে এরাই ক্যান্সার কোষের সৃষ্টি করে। ক্যান্সর কোষ এমন ধরণের কোষ যারা নিয়ন্ত্রণহীনভাবে বেড়ে চলে। ভারমাস ও বিশপ লক্ষ্য করেন, বাইরের কোন বস্তুর আক্রমণে ক্যান্সার কোষের সৃষ্টি হয় না। কিন্তু, পরিবেশের বিষাক্ততা এবং বিকিরণ বা ধূয়ার কারণে এ ধরণের পরিব্যক্তি ঘটতে পারে যা ক্যান্সার কোষ সৃষ্টিকে উসকে দেয়।

১৩. মানব রিট্রোভাইরাস এইচআইভি (১৯৮০-এর দশক)

রবার্ট গ্যালো এবং Luc Montagnier পৃথক পৃথকভাবে একটি নতুন রিট্রোভাইরাস আবিষ্কার করেন, পরবর্তীতে যার নাম রাখা হয় এইচআইভি (হিউম্যান ইমিউনোডেফিসিয়েন্সি ভাইরাস)। তারা এইড্স (অ্যাকুয়ার্ড ইমিউনোডেফিসিয়েন্সি সিনড্রম) রোগের কারণ হিসেবে এই আইরাসকেই চিহ্নিত করেন।

সর্বকালের সেরা ১০০ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার: বংশগতিবিজ্ঞান

০১. বংশগতির সূত্র (১৮৫০-এর দশক)

অস্ট্রীয় ধর্মযাজক ও উদ্ভিদবিজ্ঞানী গ্রেগর মেন্ডেল আবিষ্কার করেন, কিভাবে জিনতাত্ত্বিক তথ্যগুলো এক বংশ থেকে আরেক বংশে প্রবাহিত হয়। মটরশুঁটি চারা নিয়ে পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখেন, কোন কোন চারার বংশধরদের মাঝে মাতৃ চারার বৈশিষ্ট্য ফিরে এসেছে বা প্রকট হয়ে উঠেছে। সে সময় মেন্ডেলের গবেষণাকে কেউ গুরুত্ব দেননি। মেন্ডেল তার জীবদ্দশায় জানতেও পারেননি যে, তাকে "বংশগতিবিদ্যার জনক" বলা হবে।

০২. জিন ক্রোমোজোমের মধ্যে থাকে (১৯১০ – ১৯২০-এর দশক)

টমাস হান্ট মরগ্যান আবিষ্কার করেন, জিন ক্রোমোজোমের মধ্যে থাকে। ফলের মাছির উপর পরীক্ষা চালাতে গিয়ে দেখেন, এদের কিছু বৈশিষ্ট্য লিঙ্গের সাথে সম্পর্কিত এবং সম্ভবত বৈশিষ্ট্যগুলো যৌন ক্রোমোজোমের (এক্স এবং ওয়াই) মাধ্যমে বাহিত হয়েছে। তিনি প্রকল্পায়িত করেন, অন্যান্য জিনও ক্রোমোজোমের মাধ্যমে বাহিত হয়। ক্রোমোসোম পুনঃসংযোগের মাধ্যমে মরগ্যান ও তার ছাত্ররা ক্রোমোজোমের মধ্যে জিনের মানচিত্র তৈরী করেন। এর মাধ্যমে তারা "The Mechanism of Mendelian Heredity" নামক বিখ্যাত বইটি লিখেন।

০৩. জিন জৈব-রাসায়নিক ঘটনা নিয়ন্ত্রণ করে (১৯৩০)

George Beadle এবং Edward Tatum নিউরোস্পোরা'র (একটি ব্রেড মোল্ড) উপর পরীক্ষা চালিয়ে আবিষ্কার করেন, জিন উৎসেচক উৎপাদনের জন্য দায়ী। তাদের প্রতিবেদনের মাধ্যমেই "একটি জিন-একটি উৎসেচক" ধারণা প্রতিষ্ঠিত হয়।

০৪. কিছু জিন লাফ দিতে পারে (১৯৪০)

বারবারা ম্যাক্‌ক্লিন্টক শস্য দানায় রঙের বৈচিত্র্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ট্রান্সপন (এমন জিন যারা ক্রোমোজোমের উপর লাফ দিতে পারে) আবিষ্কার করেন। ট্রান্সপন আসলে এক ধরণের ডিএনএ অংশক যা একই কোষের জিনোমের মধ্যে বিভিন্ন অবস্থানে চলাচল করতে পারে। এই চলাচলের প্রক্রিয়ায় তারা পরিব্যক্তি এবং জিনোমের মোট ডিএনএ সংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটাতে পারে। ডিএনএ-র এই সচল অংশকগুলোকে অনেক সময় "জাম্পিং জিন" বলে।

০৫. ডিএনএ-ই জিনতাত্ত্বিক পদার্থ (১৯২৮, ১৯৪৪, ১৯৫২)

বেশ কয়েকজন বিজ্ঞানী প্রমাণ করেন, ডিএনএ-ই জিনতাত্ত্বিক তথ্যের রাসায়নিক ভিত্তি। Oswald Avery প্রমাণ করেন, ডিএনএ জিনতাত্ত্বিক তথ্য বহন করে। রিনাস পাউলিং আবিষ্কার করেন, অনেক প্রোটিন স্প্রিং কয়েলের মত কুণ্ডলাকার

রূপ নেয়। পরিশেষে জৈব-রসায়নবিদ Erwin Chargaff আবিষ্কার করেন, ডিএনএ-তে অবস্থিত কিছু নির্দিষ্ট নাইট্রোজেন ক্ষার সব সময় ১-১ অনুপাতে বিন্যস্ত হয়, এভাবে তারা ক্ষার যুগল তৈরী করে।

০৬. ডিএনএ ডাবল হেলিক্স আকৃতির (১৯৫৩)

জেম্‌স ওয়াটসন ও ফ্রান্সিস ক্রিক ডিএনএ (ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিয়িক এসিড) অণু ব্যাখ্যা করেন। তারা প্রস্তাব করেন, ডিএনএ অণু নিউক্লিওটাইডের দুটি শিকল দিয়ে গঠিত যাদের প্রতিটি একটি হেলিক্সের মধ্যে থাকে, একটি উপরের দিকে উঠে এবং অপরটি নিচের দিকে নামে। ক্রিক যোগ করেন, দুই শিকলের মাঝে ক্ষার যুগলগুলো পরস্পরের সাথে আবদ্ধ তাকে। এভাবে দুই শিকলের দূরত্ব সর্বদা সমান থাকে। তারা আরও দেখান, প্রতিটি ডিএনএ সূত্রক আরেকটি সূত্রকের জন্য ছাঁচ হিসেবে কাজ করে। এভাবে ডিএনএ অণু নিজের গঠনে কোন পরিবর্তন ছাড়াই নিজের প্রতিলিপি তৈরী করতে পারে। এক্ষেত্রে মাঝে মাঝে গণ্ডগোল ঘটতে পারে যার ফলে পরিব্যক্তি ঘটে।

০৭. জিনতাত্ত্বিক সংকেতের মর্মোদ্ধার (১৯৬০-এর দশক)

মার্শাল নিরেনবার্গ জিনতাত্ত্বিক সংকেত তথা জেনেটিক কোড আবিষ্কারকারী দলের নেতৃত্ব দেন। তারা দেখান, তিনটি নিউক্লিওটাইড ক্ষার মিলে যে কোডন তৈরী করে তার ধারাটিই জেনেটিক কোড হিসেবে কাজ করে। এই সংকেতই ২০টি অ্যামিনো এসিডের প্রতিটি নির্ধারণ করে।

০৮. আরএনএ জিনতাত্ত্বিক তথ্য বহন করে (১৯৬০-এর দশক)

বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেন, রাইবোনিউক্লিয়িক এসিড তথা আরএনএ আবিষ্কার করেন। এটি কোষের নিউক্লিয়াস ও সাইটোপ্লাজমের মধ্যে অবস্থানকারী এক ধরণের রাসায়নিক পদার্থ যার গঠন ডিএনএ-র মতো। তারা দেখেন, আরএনএ প্রোটিন সংশ্লেষণ ও কোষের অন্যান্য রাসায়নিক কার্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

০৯. প্রতিরোধ উৎসেচক (১৯৫০-এর দশক থেকে ১৯৬০-এর দশক)

বেশ ক'জন বিজ্ঞানী প্রতিরোধ উৎসেচক (রেস্ট্রিকশন এনজাইম) আবিষ্কার করেন। এরা এক ধরণের জৈবিক কাঁচি যারা নির্দিষ্ট ডিএনএ ধারা চিহ্নিত করে এবং ধারাটি কেটে ফেলে।

১০. আরএনএ স্প্লাইসিং (১৯৭৬)

বিজ্ঞানীদের কয়েকটি দল আরএনএ স্প্লাইসিং আবিষ্কার করেন। তারা দেখেন, কোষের মধ্যে প্রোটিন তৈরীর জন্য ডিএনএ প্রথমে প্রাক-বাহক আরএনএ-র মধ্যে অনুলিখিত হয়। এরপর এক অস্বচ্ছ কারণে প্রাক-বাহক আরএনএ-র মধ্যে স্প্লাইসিং ঘটে এবং তা বাহক আরএনএ-তে পরিণত হয়। অনেক জিনতাত্ত্বিক রোগে, জিন পরিব্যক্তি আরএনএ স্প্লাইসিং প্রক্রিয়ায় ব্যঘাত ঘটায়। ভুলভাবে স্প্লাইসিং হওয়া বাহক আরএনএ ত্রুটিপূর্ণ প্রোটিনের জন্ম দেয় এবং এর ফলে বিভিন্ন রোগের সৃষ্টি হয়।

১১. ডিএনএ পলিমরফিজ্‌ম (১৯৮৫)

অ্যালেক জেফ্রিস আবিষ্কার করেন, কিছু ডিএনএ অনুক্রম প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য অনন্য। এর মাধ্যমেই ডিএনএ ফরেনসিক্স-এর জন্ম হয়। তার ডিএনএ কৌশল প্রয়োগ করে প্রথম যে আসামীকে ধরা হয় তার নাম কলিন পিচফর্ক। পিচফর্ক দুটি বাচ্চা মেয়েকে ধর্ষণ করার পর খুন করেছিল। ঐ দুই মেয়ের দেহ থেকে নেয়া ডিএনএ নমুনার সাথে তার ডিএনএ নমুনা মিলে যাওয়ার পরই সে দোষী সাব্যস্ত হয়।

১২. মানব দেহে ২০,০০০ থেকে ২৫,০০০ জিন আছে (২০০৩)

মানবদেহের সকল জিনের অনুক্রম অনুসন্ধান করে জানা গেছে, মানব দেহে প্রায় ২০,০০০ থেকে ২৫,০০০ জিন আছে। অনেক বিজ্ঞানীর ভবিষ্যদ্বাণীর তুলনায় এই সংখ্যা ঝিল বেশ কম। আশা করা হয়, জিন অনুক্রম গবেষণার মাধ্যমে চিকিৎসাবিজ্ঞান ও জৈব-প্রযুক্তির অনেক উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব হবে। এর মাধ্যশে এক দিন ক্যান্সার ও অলজাইমার্সের মত রোগ নিরাময় সম্ভব হবে।

১৩. আরএনএ ইন্টারফেয়ারেন্স (১৯৯৮)

অ্যান্ড্রু ফায়ার এবং ক্রেইগ মেলো আরএনএ ইন্টারফেয়ারেন্স (আরএনএআই – RNAi) আবিষ্কার করেন। একটি জিনের অনুক্রমের সাথে মিল আছে এমন অনুক্রমের দ্বি-সূত্রক আরএনএ (dsRNA) উপস্থিত থাকলে উক্ত জিনের প্রকাশের উপর এই আরএনএ-টি হস্তক্ষেপ করে। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, যেসব dsRNA, RNAi এর ট্রিগার হিসেবে কাজ করে সেগুলোকে মাদক হিসেবে ব্যবহার করা যাবে।

সর্বকালের সেরা ১০০ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার: রসায়ন

০১. অক্সিজেন (১৭৭০-এর দশক)

জোসেফ প্রিস্ট্‌লি অক্সিজেন আবিষ্কার করেন। Antoine Lavoisier এর স্বভাব ব্যাখ্যা করেন। প্রিস্ট্‌লি পরীক্ষার মাধ্যমে অক্সিজেন তৈরী করেন এবং দহন ও শ্বসনে এর গুরুত্বের কথা উল্লেখ করেন। এরপর পানিতে স্থির বায়ু দ্রবীভুত করে কার্বনেটেড পানি তৈরী করেন। প্রিস্ট্‌লি তার নতুন আবিষ্কারের নাম রেখেছিলেন “ডিফ্লজিস্টিকেটেড গ্যাস”। Lavoisier এই গ্যাসের নাম রাখেন অক্সিজেন এবং দহনে এর সঠিক ভূমিকার বিষয়টি ব্যাখ্যা করেন। এরপর Lavoisier অন্যান্যদের সাথে মিলে রাসায়নিক নামকরণের একটি পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন যা এখনও ব্যবহৃত হয়।

০২. পারমাণবিক তত্ত্ব (১৮০৮)

জন ডাল্টন অদৃশ্য পরমাণুকে পরিমাপযোগ্য রাশি যেমন গ্যাসের আয়তন বা খনিজের ভরের মত বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত করেন। তার পারমাণবিক তত্ত্বে বলা হয়েছে, মৌল পরমাণু নামক অতি ক্ষুদ্র অসংখ্য কণা দিয়ে গঠিত। সে হিসেবে, একটি বিশুদ্ধ মৌলে একই ধরণের অসংখ্য পরমাণু থাকে আর যৌগে বিভিন্ন মৌলের পরমাণু একসাথে যুক্ত হয়।

০৩. পরমাণু একত্রিত হয়ে অণু গঠন করে (১৮১১ থেকে)

ইতালীয় রসায়নবিদ Amedeo Avogadro আবিষ্কার করেন যে, মৌল মধ্যস্থিত পরমাণুগুলো একত্রিত হয়ে অণু গঠন করে। তিনি প্রস্তাব করেন, একই তাপমাত্রা ও চাপে সম আয়তন গ্যাসে সব সময় সমান পরিমাণ অণু থাকে।

০৪. ইউরিয়া সংশ্লেষণ (১৮২৮)

Friedrich Woehler দুর্ঘটনাবশত অজৈব বস্তু থেকে জৈব ইউরিয়া সংশ্রেষ করে ফেলেন। এ থেকে প্রমাণিত হয় অজৈব বস্তু থেকে জৈব বস্তু তৈরী হতে পারে। ১৮২৮ সালের আগে মনে করা হতো, জৈব বস্তু কেবল "ভাইটাল ফোর্স"-এর সাহায্যে তৈরী করা যায়। প্রাণী এবং উদ্ভিদে যে বিশেষ প্রাণ শক্তি থাকে তাকেই ভাইটাল ফোর্স নামে অভিহিত করা হতো।

০৫. রাসায়নিক গঠন (১৮৫০-এর দশক)

Friedrich Kekule বেনজিনের রাসায়নিক গঠন আবিষ্কার করেন। এর মাধ্যমে আণবিক গঠনের বিষয়টি রসায়ন পাঠের একেবারে আবশ্যিক পর্যায়ে উঠে আসে। Kekule লিখেন, দীর্ঘ দিন যাবৎ কার্বন-কার্বন বন্ধনের প্রকৃতি নিয়ে গবেষণা করে তিনি বেনজিনের বলয় গঠন আবিষ্কার করেন। সসপ তার লেজ গুটিয়ে নিচ্ছে, এমন একটি স্বপ্ন দেখেই তার ইই বলয় গঠনের কথা প্রথম মনে হয়েছিল। কার্বন পরমাণু কিভাবে একই সাথে আরও চারটি পরমাণুর সাথে বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে, এই সমস্যার সমাধান হয় বলয় গঠন আবিষ্কৃত হওয়ার পরই।

০৬. পর্যায় সারণি (১৮৬০-এর দশক থেকে ১৮৭০-এর দশক)

Dmitry Mendeleyev লক্ষ্য করেন, তখন পর্যন্ত আবিষ্কৃত ৬৩টি মৌলকে তাদের পারমাণবিক ভরের উর্ধ্ব ক্রমানুসারে সাজালে তাদের ধর্মসমূহ একটি নির্দিষ্ট পর্যায় পরপর পুনরাবৃত্ত হয়। এর মাধ্যমে তিনি মৌলসমূহের পর্যায় সারণি তৈরী করেন এবং তখন পর্যন্ত অনাবিষ্কৃত মৌলগুলো সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করেন। এই ভবিষ্যদ্বাণী করা মৌলের মধ্য তিনটি তার জীবদ্দশায়ই আবিষ্কৃত হয়। এগুলো হল: গ্যালিয়াম, স্ক্যান্ডিয়াম ও জার্মেনিয়াম।

০৭. তড়িৎ প্রবাহ রসায়নিক যৌগের রূপান্তর ঘটায় (১৮০৭ – ১৮১০)

হামফ্রি ডেভি আবিষ্কার করেন, তড়িৎ প্রবাহ রসায়নিক যৌগের রূপান্তর ঘটায়। তিনি বৈদ্যুতিক পাইল (আদি ব্যাটারি) ব্যবহার করে ইলেকট্রোলাইসিস নামক প্রক্রিয়ায় লবণ পৃথক করেন। অনেকগুলো ব্যাটারি ব্যবহার করে ক্যালসিয়াম, স্ট্রনশিয়াম, বেরিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম থেকে পটাশিয়াম ও সোডিয়াম মৌল পৃথক করতে সক্ষম হন।

০৮. ইলেকট্রন (১৮৯৭)

জে জে টমসন আবিষ্কার করেন, ক্যাথোড রশ্মি নল থেকে ঋণাত্মক আধানে আহিত যে রশ্মি নিঃসরিত হয় তা পরমাণুর চেয়ে ছোট এবং সকল পরমাণুতেই এরা থাকে। তিনি এই কণার নাম দেন "কর্পাজ্‌ল"। বর্তমানে এগুলো ইলেকট্রন নামে পরিচিত।

০৯. রাসায়নিক বন্ধনের জন্য ইলেকট্রন (১৯১৩ থেকে)

নিল্‌স বোর তার পরমাণু মডেল প্রকাশ করেন। এতে দেখানো হয়, ইলেকট্রন নিউক্লিয়াসকে ঘিরে নির্দিষ্ট কক্ষপথে আবর্তিত হচ্ছে। কোন পরমাণুর সর্ববহিঃস্থ স্তরের ইলেকট্রন সংখ্যার উপর উক্ত পরমাণুর ধর্ম অনেকাংশে নির্ভর করে। এই আবিষ্কারের মাধ্যমেই এক সময় রাসায়নিক বন্ধনে ইলেকট্রনের ভূমিকা বোঝা সম্ভব হয়।

১০. পরমাণুতে আলোর স্বাক্ষর আছে (১৮৫০-এর দশক)

Gustav Kirchhoff ও Robert Bunsen আবিষ্কার করেন, প্রতিটি মৌল নির্দিষ্ট তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো শোষণ বা নিঃসরণ করে। এর ফলে প্রতিটি মৌলের স্বতন্ত্র বর্ণালি তৈরী হয়।

১১. তেজস্ক্রিয়তা (১৮৯০-এর দশক থেকে ১৯০০-এর দশক)

মারি ক্যুরি ও পিয়ের ক্যুরি তেজস্ক্রিয় পদার্থ আবিষ্কার ও পৃথক করেন। ইউরেনিয়াম খনিজ থেকে ইউরেনিয়াম মৌল তৈরী করার পর মারি দেখেন, অবশিষ্ট পদার্থ বিশুদ্ধ ইউরেনিয়ামের চেয়ে বেশি সক্রিয়। এর থেকে তিনি প্রস্তাব করেন, ইউরেনিয়াম খনিজে ইউরেনিয়াম ছাড়াও অন্যান্য তেজস্ক্রিয় মৌল আছে। এর ফলে পোলোনিয়াম ও রেডিয়াম আবিষ্কৃত হয়।

১২. প্লাস্টিক (১৮৬৯ – ১৯০০-এর দশক)

জন ওয়েসলি হায়াট বিলিয়ার্ড বল তৈরীতে হাতির দাঁতের পরিবর্তে সেলুলয়েড প্লাস্টিক ব্যবহারের প্রচলন করেন। সেলুলয়েড প্রথম সিনথেটিক প্লাস্টিক যা হাতির দাঁত, অ্যাম্বার, শিং ও কচ্ছপের ত্বকের মত দামী বস্তুর পরিবর্তে ব্যবহৃত হতে শুরু করে। পরবর্তীতে Leo Baekeland কঠিন প্লাস্টিক বিশেষত ব্যাকেলাইট উদ্ভাবন করেন। ইলেকট্রনিক অন্তরক হিসেবে যে শেলাক ব্যবহৃত হতো তার পরিবর্তে এই ব্যাকেলাইট ব্যবহৃত হতে থাকে।

১৩. ফুলারিন (১৯৮৫)

রবার্ট কার্ল, হ্যারল্ড ক্রোটো ও রিক স্মলি সম্পূর্ণ নতুন ধরণের এক কার্বন যৌগ আবিষ্কার করেন যার গঠন খাঁচার মত। এরপর একই ধরণের নলাকার গঠনের কার্বন যৌগ আবিষ্কৃত হয়। এই যৌগগুলোকে একসাথে "বাকমিনস্টারফুলারিন" বা সংক্ষেপে শুধু ফুলারিন বলা হতে থাকে। এই যৌগগুলো সম্পূর্ণ কার্বন দিয়ে গঠিত এবং ফাঁপা গোলক, এলিপসয়েড, নল

বা আংটির মত হয়ে থাকে। জিওডেসিক গম্বুজের উদ্ভাবক বাকমিনস্টার ফুলারের নামানুসারে এদের নাম রাখা হয়েছে। এগুলোকে বাকিবল বা বাকিটিউব-ও বলা হয়।

সর্বকালের সেরা ১০০ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার: জীববিজ্ঞান

০১. অণুজীব (১৬৭৪)

অণুবীক্ষণের লেন্স নির্মাতা Anton Van Leeuwenhoek অকস্মাৎ এক ফোঁটা পানির মধ্যে অণুজীবের সন্ধান পান। নিজের অণুবীক্ষণ যন্ত্র ব্যবহার করে তিনি শুক্রাণু, ব্যাক্টেরিয়া ও লোহিত রক্ত কণিকা পর্যবেক্ষণ করেন। তার পর্যবেক্ষণগুলো ব্যাক্টেরিয়াবিজ্ঞান ও অণুজীববিজ্ঞানের ভিত্তি স্থাপন করে দিয়ে গেছে।

০২. কোষের নিউক্লিয়াস (১৮৩১)

অর্কিড পাতা নিয়ে গবেষণা করার সময় উদ্ভিদবিজ্ঞানী রবার্ট ব্রাউন কোষের অভ্যন্তরে একটি কাঠামো আবিষ্কার করেন যার নাম তিনি দেন "নিউক্লিয়াস"।

০৩. আর্কিয়া (১৯৭৭)

কার্ল ওজ আবিষ্কার করেন, ব্যাক্টেরিয়া-ই পৃথিবীর একমাত্র আদিকোষী (প্রোক্যারিয়ট – নিউক্লিয়াসবিহীন এককোষী জীব) জীব নয়। এ ধরণের অনেক জীবকে "আর্কিয়া" নামক জগতের অধীনে একত্রিত করা হয়। এদের অনেকেই চরমজীবী অর্থাৎ, অতি উচ্চ বা নিম্ন তাপমাত্রা এবং অতি অম্লীয় বা ক্ষারীয় পরিবেশে বেঁচে থাকতে পারে। পতিত জলাভূমি, পয়ঃনিষ্কাশন পথ এবং মাটির নিচেও এদেরকে পাওয়া গেছে। আর্কিয়ার জীবগুলো অন্য জীবের কোন ক্ষতি করে না এবং এদের মাধ্যমে কোন রোগ ছড়ায় বলে জানা যায়নি।

০৪. কোষ বিভাজন (১৮৭৯)

Walther Flemming গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে দেখেন, প্রাণীকোষ বিভিন্ন ধাপে বিভাজিত হয়। এই বিভাজন প্রক্রিয়ার নাম দেন মাইটোসিস। Eduard Strasburger উদ্ভিদ কোষে একই ধরণের একটি কোষ বিভাজন প্রক্রিয়া আবিষ্কার করেন।

০৫. যৌন কোষ (১৮৮৪)

August Weismann লক্ষ্য করেন, স্বাভাবিকের তুলনায় ক্রোমোজোম অর্ধেক হয়ে যাওয়ার জন্য যৌন ক্রোমোজোমগুলোতে ভিন্ন ধরণের কোষ বিভাজন হতে হবে। এই ভিন্ন ধরণের কোষ বিভাজনকে বলে মায়োসিস। জেলি মাছের প্রজনন নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে Weismann দেখেন, পিতা-মাতার যৌন কোষে একটি বিশেষ বস্তুর বিভিন্নমুখী সম্মিলনের কারণেই বংশধরদের মাঝে বিভিন্ন পরিবর্তন ঘটতে দেখা যায়। তিনি এই বস্তুর নাম দেন "জার্ম প্লাজম"।

০৬. কোষ পার্থক্যকরণ (উনবিংশ শতকের শেষাংশ)

কোষ পার্থক্যকরণের পেছনে বেশ কয়েকজন বিজ্ঞানী অবদান রেখেছেন। এভাবে তারা মানুষের ভ্রুণীয় স্টেম কোষ পৃথক করতে সক্ষম হয়েছেন। পার্থক্যকরণের মাধ্যমে একটি কোষ নির্দিষ্ট প্রকারে রূপান্তরিত হয়। বিভিন্ন প্রকারের কোষ তখন দেহের বিভিন্ন অংশ গঠন করে, যেমন, ফুসফুস, ত্বক বা পেশী। কোষগুলো যেন নির্দিষ্ট কোন কাজ করার জন্য বিশেষ ধরণের কাঠামো তৈরী করতে পারে সেজন্য প্রয়োজনীয় জিন কার্যকরী হয়ে উঠে এবং অন্যান্যরা নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। যে কোষগুলো এখনও পৃথক হয়ে যায়নি, অর্থাৎ যারা ভবিষ্যতে যেকোন প্রকারের কোষে রূপান্তরিত হওয়ার ক্ষমতা রাখে তাদেরকেই স্টেম কোষ বলে।

০৭. মাইটোকন্ড্রিয়া (উনবিংশ শতকরে শেষাংশ থেকে বর্তমান)

বিজ্ঞানীরা কোষের শক্তিঘর তথা মাইটোকন্ড্রিয়া আবিষ্কার করেন। কোষের ভেতরে অবস্থিত এই ক্ষুদ্র কাঠামো কোষের বিপাক এবং খাদ্যকে কোষের ব্যবহার উপযোগী রাসায়নিক যৌগে পরিণত করার কাজ করে। প্রথমে ভাবা হয়েছিল এরা কোষেরই অংশ। কিন্তু বর্তমানে বিজ্ঞানীরা মনে করেছেন, এরা বিশেষায়িত ব্যাক্টেরিয়া যাদের নিজস্ব ডিএনএ আছে।

০৮. ক্রেব্‌স চক্র (১৯৩৭)

Hans Adolf Krebs, কোষ যে কয়েকটি ধাপে শর্করা, আমিষ ও চর্বিকে শক্তিতে পরিণত করে সেগুলো আবিষ্কার করেন। এর অপর নাম সাইট্রিক এসিড চক্র। এটি আসলে অক্সিজেনকে কোষীয় শ্বসনের অংশ হিসেবে ব্যবহার করে সংঘটিত রাসায়নিক বিক্রিয়ার ধারা। এই চক্রের মাধ্যমে শর্করা, আমিষ ও স্নেহ জাতীয় পদার্থ ভেঙে কার্বন-ডাই-অক্সাইড ও পানিতে পরিণত হয়।

০৯. স্নায়ু-সঞ্চারণ (উনবিংশ শতকের শেষাংশ থেকে বিংশ শতকের প্রথমাংশ)

বিজ্ঞানীরা স্নায়ু-সঞ্চারক আবিষ্কার করেন। তারা এক স্নায়ু কোষ থেকে আরেক স্নায়ু কোষে রাসায়নিক পদার্থ বা বৈদ্যুতিক সংকেত প্রেরণের মাধ্যমে দেহকে কি করতে হবে তা কিভাবে বলে, এই পদ্ধতিও আবিষ্কৃত হয়।

১০. হরমোন (১৯০৩)

উইলিয়াম বেইলিস এবং আর্নেস্ট স্টারলিং হরমোনগুলোকে তাদের নাম দেন এবং এরা কিভাবে রাসায়নিক দূত হিসেবে কাজ করে তা আবিষ্কার করেন। তারা মূলত সিক্রেটিন আবিষ্কার করেছিলেন। সিক্রেটিন নামের এই বস্তুটি ডুওডেনাম (পাকস্থলি এবং অন্ত্রের মধ্যে অবস্থিত) থেকে রক্তের মধ্যে নিঃসৃত হয় এবং অন্ত্রে প্যানক্রিয়াটিক ডাইজেস্টিভ জুস নিঃসরণে সাহায্য করে।

১১. সালোকসংশ্লেষণ (১৭৭০-এর দশক)

Jan Ingenhousz আবিষ্কার করেন, উদ্ভিদকূল চায়ার তুলনায় সূর্যালোকের প্রতি ভিন্নরকম আচরণ করে। এ থেকেই সালোকসংশ্লেষণ সম্বন্ধে ধরণা গড়ে উঠতে শুরু করে। সালোকসংশ্লেষণ একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে, উদ্ভিদ, শৈবাল ও কিছু ব্যাক্টেরিয়া ক্লোরোফিলের উপস্থিতিতে আলোক শক্তিকে রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত করে। উদ্ভিদে পাতা কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করে এবং মূল পানি শোষণ করে। সূর্যালোকের মাধ্যমে এমন এক বিক্রিয়া ঘটে যাতে গ্লুকোজ (উদ্ভিদের খাদ্য) এবং অক্সিজেন (পরিবেশে বিমুক্ত হয়) উৎপন্ন হয়। প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীর সকল জীবই এই প্রক্রিয়ার উপর নির্ভরশীল।

১২. বাস্তুতন্ত্র (১৯৩৫)

আর্থার জর্জ ট্যান্সলি "ইকোসিস্টেম" (বাস্তুতন্ত্র) শব্দটি প্রণয়ন করেন এবং একাই পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন ও বিজ্ঞানের অন্যান্য ক্ষেত্রের যে অংশগুলোতে পরিবেশ নিয়ে আলোচনা করা হয় তার সাথে জীববিজ্ঞানের বাস্তুতন্ত্রের সেতুবন্ধন রচনা করেন। কোন নির্দিষ্ট অঞ্চলের উদ্ভিদ, প্রাণিকুল, অণুজীবসমূহ এবং বিয়োজকসমূহের পারস্পরিক ক্রিয়াকলাপের ভিত্তিতে সিজেদের মধ্যে যে যৌথ বসবাসনীতি গড়ে উঠে তাকে বাস্তুতন্ত্র বলে।

১৩. ক্রান্তীয় জৈববৈচিত্র্য (পঞ্চদশ শতক থেকে বর্তমান)

ইউরোপীয় অভিযাত্রীরা সমুদ্রযোগে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণের সময় লক্ষ্য করেন, ক্রান্তীয় অঞ্চলের প্রজাতিগুলোর মাঝে বৈচিত্র্য তুলনামূলকভাবে বেশি। এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার মাধ্যমেই বর্তমানে বিজ্ঞানীদের পক্ষে পৃথিবীতে জীবন সংরক্ষণ করা সম্ভব হচ্ছে।

সর্বকালের সেরা ১০০ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার: পদার্থবিজ্ঞান

০১. পড়ন্ত বস্তুর সূত্র (১৬০৪)

এরিস্টটল বলেছিলেন একই সাথে ছেড়ে দিলে হালকা বস্তুর তুলনায় ভারী বস্তু দ্রুত পড়ে। ২০০০ বছরের এই ধারণাকে ভুল প্রমাণিত করেন গ্যালিলিও গ্যালিলি। তিনি বলেন, সকল ভরের বস্তুর পতনের হার সমান।

০২. সার্বজনীন মহাকর্ষ (১৬৬৬)

আইজাক নিউটন আবিষ্কার করেন, মহাবিশ্বের প্রতিটি বস্তু একে অপরের উপর মহাকর্ষীয় বল প্রয়োগ করে। এর ফলে প্রতিটি বস্তুই একে অপরকে আকর্ষণ করে।

০৩. গতিসূত্র (১৬৮৭)

আইজাক নিউটন বস্তুর গতিকে ব্যাখ্যা করার জন্য তিনটি সূত্র প্রদানের মাধ্যমে মহাবিশ্ব সম্বন্ধে আমাদের ধারণা আমূল পরিবর্তন করে দেন। সূত্রগুলো হল: ১) বাহ্যিক বল প্রয়োহ না করলে স্থির বস্তু আজীবন স্থির থাকবে এবং গতিশীল বস্তু সরলরেখা বরাবর সমরেখায় চলতে থাকবে। ২) বস্তুর ভরের সাথে তার ত্বরণের সম্পর্ক F=ma এবং ৩) প্রত্যেক বলেরই একটি সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে।

০৪. তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্র (১৮২৪ – ১৮৫০)

বাষ্প ইঞ্জিনের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির চেষ্টা করতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা তাপকে কাজে পরিণত করার সবকিছু বুঝতে সমর্থ হন। তারা বুঝতে পারেন, উচ্চ থেকে নিম্ন তাপমাত্রার দিকে তাপের প্রবাহই বাষ্প ইঞ্জিনকে সম্ভবপর করে তোলে। পানির প্রবাহ যেমন মিলের চাকা ঘুরায় এটা অনেকটা সেরকমই। তাদের এই গবেষণা তিনটি নীতির জন্ম দেয়: তাপ উত্তপ্ত থেকে শীতল বস্তুতে স্বতস্ফূর্তভাবে প্রবাহিত হয়, তাপকে সম্পূর্ণরূপে অন্য কোন শক্তিতে রূপান্তরিত করা সম্ভব না এবং সময়ের সাথে কোন ব্যবস্থা বিশৃঙ্খল হতে থাকে।

০৫. তড়িচ্চুম্বকত্ব (১৮০৭ – ১৮৭৩)

তড়িতের সাথে চুম্বকত্বের সম্পর্ক আবিষ্কৃত হয় এবং এই সম্পর্ক ব্যাখ্যার জন্য এক সেট সমীকরণের সৃষ্টি হয়। ১৮২০ সালে একদিন হান্স ক্রিশ্চিয়ান ওরস্টেড ক্লাসরুমে তড়িত ও চুম্বকত্বের সম্পর্কের সম্ভাবনা নিয়ে কথা বলছিলেন। লেকচারের সময় করা এক পরীক্ষায় তখনই তার কথা সত্য প্রমাণিত হয়ে যায়।

০৬. বিশেষ আপেক্ষিকতা (১৯০৫)

আলবার্ট আইনস্টাইন সময় ও স্থান সম্পর্কিত মৌলিক প্রস্তাবন উত্থাপন করেন। এর মাধ্যশে তিনি বুঝিয়ে দেন, আলোর কাছাকাছি বেগে চলমান বস্তুতে সময়ে গতি ধীর হবে এবং দৈর্ঘ্য সংকুচিত হয়ে পড়বে। একেই কাল দীর্ঘায়ন ও দৈর্ঘ্য সংকোচন বলে।

০৭. ই=এমসি২ (১৯০৫)

ভরকে আলোর বেগের দ্রুতির বর্গ দিয়ে গুণ করলে শক্তি পাওয়া যায়। আলবার্ট আইনস্টাটাইনের এই বিখ্যাত সমীকরণ প্রমাণ করে যে, ভর এবং শক্তি একই জিনিসের দুটি ভিন্ন রূপ। এ হিসেবে খুব কম ভরকে বিশাল পরিমাণ শক্তিতে রূপান্তরিত করা সম্ভব। এই ভর-শক্তি সমতুল্যতা সূত্রের আরেকটি বড় আবিষ্কার হচ্ছে, কোন কিছুই আলোর চেয়ে বেশি বেগে চলতে পারে না।

০৮. কোয়ান্টাম লম্ফ (১৯০০ – ১৯৩৫)

অতিপারমাণবিক কণার স্বভাব ব্যাখ্যা করার জন্য মাক্স প্লাংক, আলবার্ট আইনস্টাইন, ভের্নার হাইজেনবের্গ এবং এরভিন শ্রোডিঙার এক সেট নতুন প্রাকৃতিক সূত্র আবিষ্কার করেন। পরমাণুর ভিতরে ইলেকট্রনের এক শক্তি স্তর থেকে অন্য শক্তি স্তরে যাওয়াকেই কোয়ান্টাম লম্ফ বলে। এই পরিবর্তন হঠাৎ করে ঘটে, ধীরে ধীরে নয়।

০৯. আলোর প্রকৃতি (১৭০৪ – ১৯০৫)

আইজাক নিউটন, টমাস ইয়ং এবং আলবার্ট আইনস্টাইনের গবেষণা ও পরীক্ষণের মাধ্যমে বোঝা গেছে, আলো কি, এটা কিরকম ব্যবহার করে এবং কিভাবে সঞ্চারিত হয়। নিউটন প্রিজমের মাধ্যমে সাদা আলোকে বিভিন্ন রঙের আলোতে বিভক্ত করেন এবং আরেকটি প্রিজমের মাধ্যমে বিভিন্ন রঙা আলোগুলোকে একসাথে করে আবার সাদা আলো তৈরী করেন। এ থেকে বোঝা যায়, সাদা আলো বিভিন্ন রঙের আলোর সমন্বয়ে তৈরী। ইয়ং প্রমাণ করেন যে, আলো এক ধরণের তরঙ্গ এবং তরঙ্গদৈর্ঘ্যই তার রং নির্ধারণ করে। পরিশেষে আইনস্টাইন বলেন, আলোর বেগ সব সময় ধ্রুব।

১০. নিউট্রন (১৯৩৫)

জেম্‌স চ্যাডউইক নিউট্রন আবিষ্কার করেন। এটা প্রোটন ও ইলেকট্রনের সাথে মিলে পরমাণু গঠন করে। এই আবিষ্কার পরমাণু মডেলে নাটকীয় পরিবর্তন আনে এবং পারমাণবিক পদার্থবিজ্ঞানকে অনেক খানি এগিয়ে দেয়।

১১. অতিপরিবাহক (১৯১১ – ১৯৮৬)

কিছু পদার্থ আছে যারা তড়িৎ প্রবাহে কোন বাধা দেয় না, অর্থাৎ তাদের রোধ নেই। এই অপ্রত্যাশিত আবিষ্কার শিল্প ও প্রযুক্তিতে বিপুল আশার সঞ্চার করে। অনেক পদার্থেই অতিপরিবাহিতা লক্ষ্য করা যায়। অ্যালুমিনিয়ামের মত সাধারণ পদার্থ থেকে শুরু করে বিভিন্ন ধাতু সংকর ও সিরামিক যৌগে এই র্ম দেখা যায়।

১২. কোয়ার্ক (১৯৬২)

মারি গেল-মান এমন ধরণের মৌলিক কণার অস্তিত্বের প্রস্তাব করেন যারা একসাথে হয়ে প্রোটন ও নিউট্রনের মত যৌগ কণাগুলো গঠন করে। কোয়ার্কের শক্তিশালী বৈদ্যুতিক আধান আছে। প্রোটন ও নিউট্রন প্রত্যেকের মধ্যে তিনটি করে কোয়ার্ক আছে।

১৩. মৌলিক বল (১৬৬৬ – ১৯৫৭)

স্থূল এবং অতিপারমাণবিক পর্যায়ে সূক্ষ্ম পরীক্ষার মাধ্যমে বোঝা যায়, প্রকৃতির সকল মিথস্ক্রিয়া চারটি মৌলিক বলের মাধ্যশে সম্পন্ন হয়। প্রকৃতির এই মৌলিক বলগুলো হচ্ছে: দুর্বল নিউক্লীয় বল, সবল নিউক্লীয় বল, তড়িচ্চুম্বকীয় বল এবং মহাকর্ষ বল।

১০ জন প্রতিভাধর ব্যক্তিঃ আবিষ্কার যাদের জীবনে কাল হয়ে দাড়িয়েছিল

১০ জন প্রতিভাধর ব্যক্তিঃ আবিষ্কার যাদের জীবনে কাল হয়ে দাড়িয়েছিল

এই পৃথিবীতে যুগ যুগ ধরে বহু জ্ঞানী, গুনী ব্যক্তিদের আগমন ঘটেছিল। এই সকল জ্ঞানী, গুনী ব্যক্তিরা তাদের মেধা,বৃত্তি ও মনন দিয়ে অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে পৃথিবীর জন্য , পৃথিবীর মানুষের জন্য অপরিসীম অবদান রেখে গেছেন , আবার অনেক জ্ঞানী প্রতিভাবান ব্যক্তি সৃষ্টির জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ পর্যন্ত করে গেছেন। আজ এমনি ১০ জন প্রতিভাধর ত্যাগী ব্যক্তির সমন্ধে সংক্ষেপে আপনাদের সাথে শেয়ার করবো।

১. মাদাম কুরি (মেরি কুরি)ঃ রসায়ন শাস্ত্রে অসাধারণ অবদান রাখার জন্য দুই বার নোবেল পুরুস্কার লাভ করেন এই বিদুষী নারী মাদাম কুরি (মেরি কুরি)। তেজস্ক্রিয়তার ময়দানে তেজস্ক্রিয় রশ্মি বিষয়ে প্রথম মৃত্তিকাখনক বা পথপ্রবর্তক হিসাবে পোল্যান্ডের বংশভূত ফ্রান্সের নাগরিক মাদাম কুরির আবিস্কৃত সূত্র বর্তমান আধুনিক বিজ্ঞানেও নানাবিধ ব্যবহার

হয়ে থাকে। তিনি হচ্ছেন মহিলাদের মধ্যে সর্বপ্রথম যিনি দুইবার নোবেল পুরস্কার অর্জন করেন।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে এসে এই মহিয়সী নারী আবিস্কারের নেশায় নিজেকে সম্পূর্ণভাবে সোপর্দ করেন গবেষনার কার্যে । দিনরাত বুদ্ধিবৃত্তিক অনুসন্ধান করতে গিয়ে ভুলে যান নিজের দেহ ও স্বাস্থের কথা। এইভাবে নিজের শরীরকে অবজ্ঞা করার কারণে কোনো একসময় তার দেহে বাসা বাধে মরণঘাতী রোগ আর তেজস্ক্রিয় রশ্মির পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ায় দুই চোখের জ্যোতি হারিয়ে হয়ে যান সম্পূর্ণ অন্ধ। অবশেষে ১৯৩৪ সালে এই ক্ষণজন্মা নারী মৃত্যু বরণ করেন।

২.অট্টলিলিয়েনথালঃ বিমান চালনার কৌশল বা বিদ্যায় যে সকল পথপ্রবর্তকদের নাম উল্লেখযোগ্য তাদেরই মধ্যে একজন এই জার্মানির প্রকৌশলী ও বৈমানিক অট্টলিলিয়েনথাল। এই প্রতিভাবান বৈমানিক ১৮৯১ সাল থেকে ১৮৯৬ সালের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত ২ হাজারেরও অধিক ফ্লাইট অত্যন্ত সফলতার সাথে সমাপ্ত করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। কিন্তু ১৮৯৬ সালের ৯ আগস্ট তার উপর নেমে আসে অশুভের কালোছায়া। সেদিন একটি বিমান পরিচালনা করতে গিয়ে দুর্ঘটনাবসত ১৭ মিটার উচ্চতা থেকে বিমানসহ নিচে পরে গিয়ে তিনি গুরুতর আঘাতপ্রাপ্ত হন। তার মেরুদন্ডের হাড় ভেঙ্গে চূর্ণ হয়ে যায় , চিকিৎসার জন্য তাকে দ্রুত বার্লিন হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হলেও এই প্রতিভাবান উদ্ভাবককে বাচাঁনো সম্ভব হয় না। মৃত্যুর প্রাক্কালে প্রতিভাবান ত্যাগী বিজ্ঞানী বলে গিয়েছিলেন "প্রয়োজনের খাতিরে সবসময় ছোট খাটো কিছু উৎসর্গ করতে হয় "।

৩. টমাস মিডগ্লেইঃ এই প্রতিভাবান ব্যক্তিটি হচ্ছেন যুক্তরাষ্ট্রর একজন প্রকৌশলী। প্রথম জীবনে প্রকৌশলী হলেও শেষ জীবনে তিনি রসায়ন শাস্ত্রে গবেষণা করে পেট্রোল ও সীসা বিষয়ক প্রভূত উন্নতি ও সম্প্রসারিত করেন। রসায়নবিদ্যায় গবেষণাকালে একসময় তিনি পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ায় আক্রান্ত হয়ে অক্ষম হয়ে পড়েন। কিন্তু তার এই শারীরিক দুর্বলতা তার ভেতরের আবিস্কারের ইচ্ছাকে দাবিয়ে রাখতে পারেনি।

তিনি একসময় হাসপাতালের পঙ্গু ও অক্ষম রোগীরা বিছানা থেকে যাতে প্রয়োজন অনুযায়ী সহজে উঠতে পারে সেজন্য মাথা খাটিয়ে বিছানায় রজ্জু ও কপিকল স্থাপন করার চিন্তা বার করলেন। কিন্তু বিধিবাম, ১৯৪৪ সালের ২ নভেম্বর টমাস তার কঠিন উদ্ভাবনটির কার্যকারিতা সশরীরে পরীক্ষা করতে গিয়ে কপিকলের রশি তার গলায় পেঁচিয়ে যায় এবং ঘটনাস্থলেই তিনি স্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা যান ।

৪.আলেকজান্ডার বোগডানোভঃ রক্ত পরিসঞ্চালনের মাধ্যমে মানব দেহে পুনর্যৌবন লাভ ও পুনরুজ্জীবন লাভের লক্ষে বিরামহীন গবেষণা চালিয়ে গেছেন বেলোরুশিয়ার বিদ্বান ব্যক্তি আলেকজান্ডার বোগডানোভ। চিকিৎসা বিজ্ঞানে প্রভূত উন্নতি সাধনকারী বোগডানোভ পুনরুজ্জীবন লাভ করার মত অভাবনীয় আবিস্কারের আশায় তিনি তার নিজ দেহে ১১ বার রক্ত পরিসঞ্চালন করেছিলেন। কিন্তু অদৃষ্টের পরিহাস ১৯২৮ সালে তার এক ছাত্র, যক্ষা ও ম্যালেরিয়ার রোগীর রক্ত নিজ দেহে পরিসঞ্চালন করে অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং ৭ এপ্রিল ১৯২৮ সালে তিনি শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেন ।

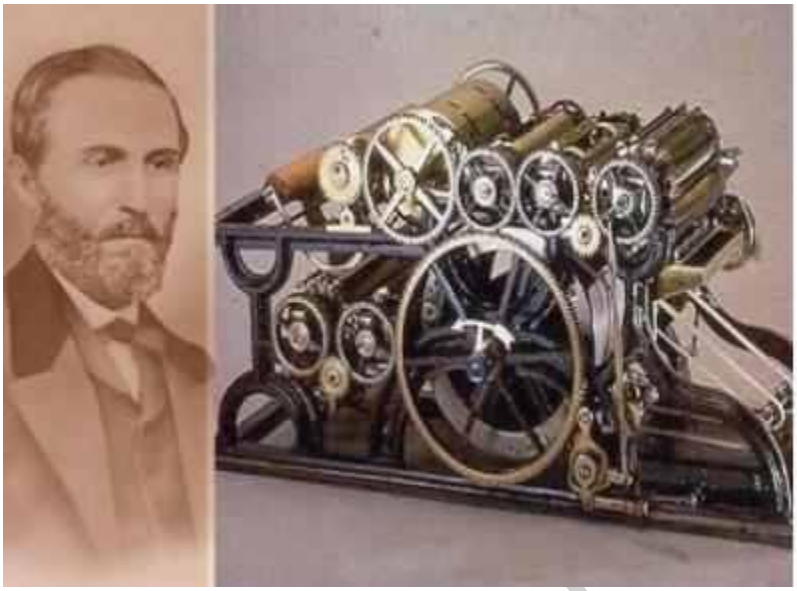

৫.উইলিয়াম বুলোকঃ যুক্তরাষ্ট্রের এই প্রতিভাবান ব্যক্তিটি ১৮৬৩ সালে সংবাদ ছাপার ঘূর্ণনশীল মেশিন বা রোটারি মেশিন আবিস্কার করে উনবিংশ শতাব্দীর প্রিন্ট মিডিয়ায় অভূতপূর্ব অবদান রেখেছিলেন । কিন্তু ভাগ্যের লিখন তারই আবিস্কৃত মেশিনের কারণে তাকে পৃথিবীর মায়া ছেড়ে চলে যেতে হয় । ১৮৬৭ সালে ৩ এপ্রিল যুক্তরাষ্ট্রের ফিলাডেলফিয়ায় তার রোটারি মেশিনের গিয়ার নিয়ন্ত্রণ করতে গেলে দুর্ভাগ্যজনকভাবে মেশিনের একটি রোল গড়িয়ে তার পায়ের উপর পরে এবং সাথে সাথে তার পা দুটি চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায়। একপর্যায়ে সেবা ও চিকিৎসার অভাবে এই হতভাগ্য প্রতিভাবানের পা দুটি পচন ধরে। অবশেষে ডাক্তারগণ বুলোক এর দুটি পা কেটে আলাদা করার দিনক্ষণ ঠিক করেন কিন্তু বুলোক তার আগেই ১৮৬৭ সালের ১২ এপ্রিল পৃথিবীর মায়া ছেড়ে চলে যান ।

৬.ফ্রান্জ রেইচেল্টঃ অট্রিয়ার দর্জি ফ্রান্জ রেইচেল্ট প্যারাসুট কোট আবিস্কারক হিসাবে সবার কাছে পরিচিত ছিলেন। তিনি তার আবিস্কৃত কোটাখানা পড়ে কোনো উচ্চস্থান থেকে লাফিয়ে ধীরে ধীরে মাটিতে নামতে পারতেন। অবশ্য এর আগেও তার এ ধরনের কয়েকটি প্রয়াস ব্যর্থ হয়েছিল। কিন্তু ১৯১২ সালের ৪ ফেব্রুয়ারী তার জীবনের অন্তিম মহুর্ত্ত এসে হাজির হয় যখন তিনি প্যারিসের আইফেল টাওয়ারের সামনে বিশাল দর্শক সমাগম করে তার আবিস্কারটি প্রদর্শনের উদ্যোগ নেন। ফ্রান্জ রেইচেল্ট তার প্যারাসুট পড়ে প্যারিসের আইফেল টাওয়ারের প্রথম ডেক থেকে নিচে ঝাপিয়ে পড়েন কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে তার প্যারাসুটটি উন্মুক্ত না হওয়ার কারণে মাটিতে পড়ে তিনি সাথে সাথে মৃত্যুবরণ করেন।

৭.[sbজিমি হেসেল্ডেনঃ] সেগওয়ে নামক আধুনিক দুই চাকাওয়ালা গাড়ী কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা হচ্ছেন এই ব্রিটিশ ধনকুবের জিমি হেসেল্ডেন। জিমি হেসেল্ডেন গতবছর ২৬ সেপ্টেম্বর মাসে তার কোম্পানির সর্বশেষ মডেলের দুই চাকা বিশিষ্ট গাড়ী চালানোর সময় তার বাড়ীর পার্শ্ববর্তী একটি নদীতে পড়ে মৃতুবরণ করেন। এই ধনকুবের জিমি হেসেল্ডেন এর সম্পদের পরিমান ছিল ১৬৬ মিনিয়ন পাউন্ড।

৮. আওরেল ভ্লাইকোঃ রোমানিয়ার এই প্রতিভাবান প্রকৌশলী ও বৈমানিক ১৫ জুন ১৮৮২ সালে জন্মগ্রহন করেন। জীবনের শুরু থেকেই বিমানচালনা ও বিমান চালনাবিদ্যার উপর ছিল তার দারুন নেশা কিন্তু কখনই তিনি কল্পনা করতে পারেননি স্বল্প বয়সে একদিন এই নেশাই তাকে তার সমাধিতে নিয়ে যাবে। এই প্রতিভাবান বৈমানিক বেশকয়েকটি এ্যারিয়েল বিমানের আদিরূপ বিমান তৈরী করেন এবং অত্যন্ত সফলতার সাথে বিমান উড্ডায়ন ও অবতরণ পরীক্ষা সম্পন্ন করেন । ১৯১৩ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর ছিল তার জীবনে চরম এবং শেষ দুর্যোগের দিন। সেদিন নিজের আবিস্কৃত বিমান "ভ্লাইকো II নিয়ে আকাশে বেড়াচ্ছিলেন, হঠাৎ বিমানের ইঞ্জিনে গোলযোগ দেখা দিলে উদ্ভাবক চেষ্টা করেও বিমানকে নিয়ন্ত্রণে আনতে ব্যর্থ হন। বিমানটি কার্পাথিয়ান পাহাড়ের গায়ে লেগে বিধ্বস্ত হয় এবং সেই সাথে প্রতিভাবান তরুণ আওরেল ভ্লাইকোর জীবনের অবসান ঘটে ।

৯.ভ্যালেরিয়ান আবাকোসস্কিঃ ১৮৯৫ সালে রাশিয়ায় এই উদীয়মান উদ্ভাবক জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন তখনকার "এ্যারো ওয়াগেন" নামে দ্রুত গতিসম্পন্ন বিলাসবহুল রেলগাড়ির আবিস্কারক। ভ্যালেরিয়ান আবেকভস্কি তখনকার রাশিয়ার নামিদামি রাজনীতিকদের বিলাস ভ্রমণের কথা মাথায় রেখে এই দ্রুতগতির রেল ইঞ্জিন তৈরী করেছিলেন। বর্তমানে যে সকল দ্রুতগতি সম্পন্ন যানবাহনে এম-৪৭ ইঞ্জিন ব্যবহার করা হয়, ভ্যালেরিয়ানের ইঞ্জিন ছিল তার আদিরূপ।
২৪ জুলাই ১৯২১ সাল ছিল ভ্যালেরিয়ান এর রেলগাড়ি পরীক্ষার ১ম দিন। সেদিন ভ্যালেরিয়ানসহ রাশিয়ার ৬ জন উচ্চ পদস্থ ব্যক্তি এই রেলগাড়িতে আহরণ করেন। দ্রুতগতিতে রেলগাড়িটি চলার সময় এক পর্যায়ে চালক তার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে এবং রেল গাড়িটি লাইনচ্যুত হয়ে উল্টে যায়। সেই সাথে জীবনের অবসান ঘটে ৬ জন উচ্চ পদস্থ ব্যক্তিসহ ভ্যালেরিয়ান আবাকোসস্কির।

১০. ডোনাল্ড ক্যাম্পবেলঃ ব্রিটিশ রেসার। তিনি ছিলেন ৫০ দশকে জলে ও স্থলে গাড়ির দৌড় প্রতিযোগিতায় একের পর এক নতুন রেকর্ড সৃষ্টিকারী । তিনি প্রতিযোগিতায় যে জলযান ব্যবহার করতেন সেটার নামছিল ব্লু বার্ড -কে ৭ এবং এই গাড়িটির সর্বোচ্চ গতিবেগ ছিল ঘন্টায় ৩ শত মাইল। কিন্তু তার নেশা ছিল কিভাবে গতি আরো বৃদ্ধি করা যায় এবং দ্রুত জয় ছিনিয়ে আনা যায়। ১৯৬৭ সালের ৪ জানুয়ারী একটি প্রতিযোগিতায় ডোনাল্ড ক্যাম্পবেল কৌশল প্রয়োগ করে তার

গাড়ির গতি ঘন্টায় ৩ শত মাইল থেকে ৩৩০ মাইল বাড়িয়ে দেন ফলে জলযানটি ভারসাম্য রক্ষা করতে না পেরে উল্টে যায় এবং **একই সাথে নিভে যায় ডোনাল্ড ক্যাম্পবেল এর জীবনের প্রদীপ** ।

(ইন্টারনেট হতে সংগ্রহীত)

Tanbir Ahmad Razib

Mobile No:→ 01738 -359555//01916-457075

E --Mail: →tanbir_cox@yahoo.com //tanbir.cox@gmail.com

Facebook: → http://www.facebook.com/tanbir.cox

Web Site : → http:// tanbir.99k.org

_DO
_NOT
_FORGET
_TO
_call!
_And TO
_Say
_Thanks

Any comments and critics are welcome.

All Copy right -T@NB!R.